SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
Vol. 1, Issue-2, (Apr-Jun) 2025

নন্দীগ্রাম থানায় লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও বীরাঙ্গনা চিকনবালা জানা

Salt Satyagraha Movement in Nandigram Police Station and Birangana Chikanbala Jana

Dr. Soumyadeb Maiti
Assistant Professor, Department of History
Rabindra Bharati University, CDOE
West Bengal, India
Email: maiti.debsoumya@gmail.com

Abstract: Nandigram police station under Tamluk subdivision of Medinipur district holds a significant place in the history of India's freedom struggle. Nandigram police station, although a small isolated area of Tamluk subdivision, was a place of great terror in the eyes of the British. The Salt Satyagraha movement also took a strong shape in Nandigram police station as an integral part of the freedom movement. The civil disobedience movement gained a special dimension in Nandigram police station under Tamluk subdivision. In conducting the movement in Nandigram police station, women also joined hands with men. In addition, they spontaneously participated in numerous general women's movements. One of the heroines among the women who participated in the movement was Chikanbala Jana. She was one of the greatest soldiers in the Salt Satyagraha Movement of Nandigram police station. Chikanbala Devi, despite being an ordinary village woman, she was ready to sacrifice everything for freedom. She was ready to break the chains of his motherland. Her contribution is undeniable. Despite hundreds of tortures and arrests by the British police, she was steadfast in his cause of liberating the motherland.

Keywords: Salt Satyagraha, Nandigram, Women, British, Motherland.

১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে মতাদর্শগত বিভেদ ও ঘাত প্রতিঘাত আইন অমান্য আন্দোলনের পটভূমি তৈরি করেছিল। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করার পর যে সার্বিক হতাশা ও নিষ্ক্রিয়তা দেখা দিয়েছিল, এই সময়ের মধ্যে তা কেটে গেলেও লক্ষ্য ও পথ নিয়ে তীব্র মতভেদ একটা অনিশ্চিয়তা ও অস্থিরতার পরিবেশ তৈরি করেছিল। জনসাধারণের মধ্যে

ক্ষোভ ও অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল এবং কিছু একটা করার জন্য তারা যেন মরিয়া হয়ে উঠেছিল। কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনগুলি ছিল এই গভীর ক্ষোভ ও হতাশারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিতবাহী। সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলন অবশ্য সাময়িক ঐক্য এনেছিল সর্বস্তরে। তবে কংগ্রেসের নবীন ও প্রবীণ নেতাদের মধ্যে পূর্ণ স্বরাজ ও ডোমিনিয়ান স্টেটাস নিয়ে তর্ক বিতর্ক সংগ্রামের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। ইংরেজ শাসকদের অনমনীয় মনোভাব ও গান্ধী-আরউইন আলাপ আলোচনার ব্যর্থতা এক অচল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। বোঝা গিয়েছিল প্রত্যক্ষ আন্দোলন ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। শেষ পর্যন্ত লাহোর কংগ্রেসে একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও নীতি স্থির করার ফলে আইন অমান্য আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

কিন্তু একমাত্র রাজনৈতিক প্রস্তুতি কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে না। জনগণের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ও অসন্তোষ যে কোন আন্দোলনের প্রাথমিক শর্ত। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ দীর্ঘ দিন ধরেই জমা হচ্ছিল। আইন অমান্য আন্দোলনের আগে সেই ক্ষোভ তীব্রতর হ'য়েছিল। ১৯৩০ এর দশকে গণ আন্দোলনের সঙ্গে ঐ সময়ের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট ও মন্দার যোগ ছিল প্রত্যক্ষ। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার ধাক্কায় ভারতের অর্থনীতি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হ'য়েছিল। কৃষিজাত দ্রব্য সামগ্রীর দাম ভীষণভাবে পড়ে যাওয়ার ফলে কৃষকদের দুরবস্থার অন্ত ছিল না। একটা ছোট উদাহরণ দিলেই বিষয়টি বোধগম্য হবে। বাংলায় ১৯২৯ সালে চালের দাম যা ছিল, ১৯৩২ সালে তা প্রায় অর্ধেক হ'য়ে যায়। কিন্তু খাজনা, কর ও সুদের বোঝা কমে নি। এর ফলে অবশ্য ধনী ও মাঝারি কৃষকরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছিল। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে এঁরা নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। মনে হতে পারে দ্রব্যমূল্য হ্রাসের ফলে বাঁধা মাইনের মধ্যবিত্তের সুবিধা হ'য়েছিল। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী দেখিয়েছিল অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তবে তা হয় নি।[১] শ্রমিকদের অবস্থাও ভাল ছিল না। বিশ্বব্যাপী মন্দার আঘাত থেকে তারাও রেহাই পায় নি। শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ অবশ্য আগে থেকেই দানা বাঁধছিল। একমাত্র ১৯২৮ সালেই ভারতে ২৩০টি শিল্প ধর্মঘটের ঘটনা ঘটেছিল। কাজেই আইন অমান্য আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিতে সাধারণ মানুষের দেরী হয় নি। এক দিক থেকে দেখতে গেলে অসহযোগ আন্দোলনের চেয়েও আইন অমান্য আন্দোলনের পরিস্থিতি ছিল অনেক বেশি অগ্নিগর্ভ।[২]

এই সংকটজনক মূহুর্তে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন বসলো ১৯২৯ সালে লাহোরে। সভাপতি হলেন জহরলাল নেহরু। যাই হোক লাহোর কংগ্রেসেই গৃহীত হলো পূর্ণস্বরাজের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। ৩১ শে ডিসেম্বর উড়লো ভারতের তেরঙ্গা পতাকা। স্থির হলো ২৬ শে জানুয়ারী পালন করা হবে স্বাধীনতা দিবস।জন্ম নিল এক নতুন আশা ও উত্তেজনা। অসহযোগ ও আইন অমান্যের সিদ্ধান্তও নেয়া হলো। ১৯২৯ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর রাভি নদীর তীরে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সেই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে প্রখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী লিখেছেন "বহুদিনের ওপারে একদিন মধ্যরাত্রে আমরা শিবির ছাড়িয়া ছুটিয়া বাহির হইয়াছিলাম। সেদিন রাভি নদীর নিস্তব্ধ দুই তীর আমাদের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হইয়াছিল। তুষার শীতল নদীতীরে শীতের প্রচণ্ড হিংস্রতা আমাদের নিরস্ত করিতে পারে নাই। কারণ আমাদের মনের মধ্যে উত্তাপ ছিল। বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা, তর্ক বিতর্ক আর সংগ্রামের মধ্যে দিয়া

আমরা এখন উপলব্ধি করিয়াছি যে, সাম্রাজ্যবাদই আমাদের প্রধান শত্রু।.... রাভি নদীর তীরে দাঁড়াইয়া আমরা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলাম যে, সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য হইতে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা প্রত্যেক ভারতবাসীর অবিচ্ছেদ্য অধিকার।"[৩]

যাই হোক আরউইনকে লেখা চিঠিতে গান্ধী জানালেন যে ভারতের কাছে ব্রিটিশ শাসন হচ্ছে 'অভিশাপ', কেননা এর ফলে ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষকে চরম অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে এবং ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লুপ্ত হতে চলেছে। আরউইন এ চিঠির জবাব দিলেন না, গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করলেন এবং তাঁকে গ্রেপ্তারও করলেন না। গান্ধী বললেন-"On bended knee I asked for bread, and I received stone instead."[৪] তিনি আরও বললেন-"The government is puzzled and perplexed."[৫] কিন্তু এর পর আন্দোলন ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না।

গান্ধী বড়লাটকে জানিয়ে ছিলেন যে ১১ই মার্চ লবণ আইন ভঙ্গ করে তিনি আন্দোলন শুরু করবেন। কেন লবণ আইন বেছে নিলেন, তা ব্যাখ্যা করে গান্ধী বললেন-"There is no article like salt outside water by taxing which the state can reach even the starving millions, the sick, the maimed and the utterly helpless. The tax constitutes therefore the most inhuman poll tax the ingenuity of man can devise."[৬] অর্থাৎ লবণ আইন ভঙ্গ ছিল এক প্রতীকী আন্দোলন। ১২ই মার্চ গান্ধী তাঁর ৭৮ জন ঘনিষ্ঠ সহচর নিয়ে সাবরমতী আশ্রম থেকে ডাণ্ডী অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন। উদ্দেশ্য ছিল খোলাখুলিভাবে আইন ভঙ্গ করে সমুদ্র জল থেকে লবণ তৈরী করা। গান্ধীর পদযাত্রা চতুর্দিকে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো। প্রায় ২৪০ মাইল পথের সর্বত্র তাঁকে গ্রামের কৃষকেরা স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানালেন। ৬ই এপ্রিল গান্ধীজী লবণ আইন ভঙ্গ করলেন।

গান্ধীজির ডান্ডি অভিযানে মেদিনীপুরের এক প্রতিনিধি ছিলেন তিনি হলেন মতিলাল দাস।[৭] গান্ধীজির লবণ আইন ভঙ্গ কর্মসূচী সমগ্র দেশে এক তীব্র উদ্দীপনার সঞ্চার করে এবং দেশবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়েছিল। ৬ই থেকে ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত সমগ্র ভারতে জাতীয় সপ্তাহ ঘোষিত হল এবং এইভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা হল।[৮]

বাংলার অন্যান্য জেলাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর জেলাতেও আইন অমান্য আন্দোলন সর্বাত্মক রূপ ধারণ করেছিল। মেদিনীপুর জেলার সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল কাঁথি মহকুমা ও তমলুক মহকুমাতে লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল, সেই সঙ্গে ঘাটাল মহকুমা সহ সমগ্র অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার প্রতিটি অঞ্চলের নরনারীগণ এই গণ আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। সমুদ্র ও নদী তীরবর্তী মেদিনীপুর যে লবণ আইন অমান্যের উপযুক্ত ক্ষেত্রস্থল তা কুমিল্লার (বর্তমান বাংলাদেশ) অভয় আশ্রমের তদানীন্তন সভাপতি ডঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যতম সদস্য অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী ও ড. নৃপেন্দ্রনাথ বসু গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করে জানান এবং মেদিনীপুরের জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে কতদূর অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে তাও আলোচিত হয়। গান্ধী অভয় আশ্রমের কর্মীদের মেদিনীপুরের লবণ সত্যাগ্রহ পরিচালনার নির্দেশ দেন।[৯] এরপর জেলা জুড়ে আন্দোলনের জোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়, ১৯শে মার্চ (১৯৩০) সমগ্র জেলার কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে এক আন্দোলন আহুত হল মেদিনীপুর শহরে। মহাত্মা গান্ধীর প্রদর্শিত পথে

পদযাত্রা করে আগের দিন অর্থাৎ ১৮ই মার্চ মেদিনীপুরে পৌঁছানোর জন্য প্রতি মহকুমার কংগ্রেস কমিটি ও কর্মীদের কাছে বার্তা পাঠানো হল। মেদিনীপুর সদর, তমলুক, ঘাটাল, কাঁথি প্রভৃতি মহকুমা থেকে সুসংবদ্ধ কর্মীর দল নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুসারে মেদিনীপুর শহরে এসে পৌঁছান।[১০] মেদিনীপুরের অন্তর্গত নাড়াজোলের দেশপ্রেমিক জমিদার কুমার দেবেন্দ্রলাল খানের মেদিনীপুর শহরের বাড়িতে সম্মেলনে আগত কংগ্রেস কর্মীদের আহারের ব্যবস্থা করা হয়।[১১] এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহকুমা আইন অমান্য পরিষদ গঠিত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন গান্ধী অনুরাগী পুরুলিয়ার নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত।[১২] এইভাবে আইন অমান্য পরিষদ গঠনের মাধ্যমে মেদিনীপুরে আন্দোলন পরিচালনার পরিকাঠামো গঠন করা হয়েছিল।

ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনে বাংলার উপকূলবর্তী জেলা মেদিনীপুরের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙালী মেয়েদের গৌরবময় ভূমিকায় মুগ্ধ হয়ে স্বামীর সঙ্গে ভারত ভ্রমণে এসে মিসেস ম্যাকডোনাল্ড বলেছিলেন— "One feels there is a tremendous movement going on amongst the women. We are fond of labelling the Indian aspirations as seditions, when if they were amongst ourselves, we should call them patriotism. This movement seems to be spreading as much amongst the women as amongst the men."[১৩] আইন অমান্য আন্দোলন পর্বে মেদিনীপুরের নারীসমাজের অংশগ্রহণ ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জেলার উচ্চবিত্ত পরিবারের শিক্ষিতা রমণীদের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ গ্রাম্য রমণী, বিধবা রমণী এবং সমাজের নিচুতলায় অবস্থানকারী পতিতা পল্লীর বারাঙ্গনারাও আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামিল হয়েছিলেন।

তমলুক মহকুমার নন্দীগ্রাম থানাটীর পূর্ব পার্শ্বে হুগলী নদী এবং উত্তরে হলুদী নদী প্রবাহিত এবং থানার অন্তবর্তী খাল গুলিতে লবণাক্ত জলের জোয়ার ভাঁটা চলে এজন্য থানার সব অঞ্চলেই লবণ মাটা ও লবণ জল সুলভ। থানার বহু স্থানে লবণ মাটীর পলি জমে থাকে। কাজেই নুন তৈয়ারীর জন্য পরিশ্রুত লবণ জলের অভাব হয় না। থানার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ২৬টি লবণ কেন্দ্র খোলা হয়। এই গুলির পরিচালনার জন্য সতীশ চন্দ্র সাহু, ধরণীধর প্রধান, ডাঃ হৃষীকেশ দাস, যমুনাকান্ত রায়, বরদাকান্ত দাস, কুঞ্জবিহারী ভক্ত, রাজেন্দ্র নাথ ভুঞ্যা, বরেন্দ্র নাথ খাঁড়া, পরেশ চন্দ্র জানা, নগেন্দ্র নাথ সরকার, মায়া দাস প্রমুখ কর্মীগণ বিশেষ ভাবে চেষ্টা করেন। কেন্দ্রগুলির মধ্যে নন্দীগ্রাম, তেখালি, আশদতলিয়া, খোদাম বাড়ী, হাঁসচড়া, ঈশ্বরপুর, ঘোলপুকুর, টাকাপুরা ও চৌখালি প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি কেন্দ্রে পুলিশ জনতার উপর -স্ত্রীপুরুষ নির্বিচারে বেত, লাঠী ও বেটন চালায় ও অন্যান্য প্রকার অত্যাচারে তাদেরকে জর্জরিত করে।[১৪]

তমলুক মহকুমার অন্তর্গত নন্দীগ্রাম থানাতে লবণ আইন অমান্য আন্দোলন বিশেষ ব্যাপকতা লাভ করেছিল। মহকুমা সমর পরিষদের নির্দেশ অনুযায়ী নেতৃস্থানীয় কংগ্রেস কর্মীগণ আত্মগোপন করে নন্দীগ্রাম থানার ১৫টি ইউনিয়নে আইন অমান্য আন্দোলনের গতিকে দুর্বার ও অপ্রতিরোধ্য করবার জন্য জনসাধারণকে সংগঠিত করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে ১৫টি ইউনিয়নের সবকটি কংগ্রেস শিবির বেআইনি ঘোষিত হয়েছে এবং ১৪৪ ধারাও বলবৎ করা হয়েছে। থানা পরিষদের ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বরের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লবণ সত্যাগ্রহ ও আবগারী দোকান পিকেটিং শুরু করলেন। স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে

নির্দিষ্ট কাজ ভাগ করে দেওয়া হল। তাঁরা কেউ বা সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ, কেউ বা স্বেচ্ছাসেবকের কাজ, কেউ বা বুলেটিন প্রচারক, হিসেবে কাজ করবেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্যন্ত নন্দীগ্রাম থানার ৮৫টি কেন্দ্রে মোট ১২৫ বার লবণ সত্যাগ্রহ, ১১৮বার আবগারি ও মাদক বর্জনে পিকেটিং এবং ৪৪ বার হরতাল পালন করা হয়েছিল। এই আন্দোলনে ১২৩৯ জন নারী পুরুষ সত্যাগ্রহীর নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।[১৪]

এই অহিংস আন্দোলনের ব্যাপ্তি, গুরুত্ব যে কতদূর সীমাহীন ছিল তার বিস্তারিত বর্ণনা থানা কংগ্রেস কর্তৃক সংগৃহীত ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্য থেকে।

১ নং ইউনিয়ন: চৌখালি বাজার, বরোজ, গোখুরী, ঘাটনান, ঘোলাপুকুর পাড়, নেতুড়িয়া, বুরুন্দা এই ৭টি স্থানে সত্যাগ্রহ চলেছিল। প্রত্যেক কেন্দ্রে ৫ থেকে ১০ জন নারী পুরুষ সত্যাগ্রহী এবং ৫০০ থেকে ১০০০ শোভাযাত্রী দর্শক উপস্থিত হত। তবে প্রতিটি স্থানে পুলিশী অত্যাচার অব্যাহত ছিল।

২ নং ইউনিয়ন: ৫ই ফেব্রুয়ারি ও ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩২ সালে ঈশ্বরপুর কেন্দ্রে পিছলাপা গ্রামের গোবিন্দ প্রসাদ মাইতির নেতৃত্বে ৫০ জন নারী ও ৪০ জন পুরুষ সত্যাগ্রহী লবণ আইন অমান্য করে ৩২ জন গ্রেপ্তার বরণ করেন। এই ৩২ জন সত্যাগ্রহীর ১ বছর থেকে ৩ মাস পর্যন্ত জেল হয়। শরীপুর (পদ্মপুকুর পাড়), কুলুপ (শিবালয় প্রাঙ্গণ), সুলতানপুর, বাবুইয়া ও বামুনআড়া এই ৬টি স্থানে সত্যাগ্রহ চলেছিল। ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৩২-এ বামুনআড়া কেন্দ্রে আইন অমান্যকারী স্বেচ্ছাসেবক সত্যাগ্রহী নরেন্দ্রনাথ গিরি ও অনন্ত গিরি গ্রেপ্তার বরণ করেন। ৩ মাস করে কারাদণ্ড হয়।

৩নং ইউনিয়ন: কাণ্ডপসরা, বরাঘুনি, খাগদা, উড়উড়ী, বাহাদুরপুর, নরঘাট, চিন্তামণিপুর এই ৭টি স্থানে সত্যাগ্রহ চলেছিল। ৪ঠা মে ১৯৩২-এ সৌদামিনী মাইতির নেতৃত্বে চিন্তামণিপুরে ৭০০ শোভাযাত্রীর উপস্থিতিতে লবণ আইন অমান্য করা হয় ।

৪ নং ইউনিয়ন: নন্দপুর, হরিচক (রথতলা), মুরাদপুর, ওসমানপুর, নানকাচক ও ঝাটীবনী এই ৬টি স্থানে সত্যাগ্রহ চলছিল।[১৫]

৫ নং ইউনিয়ন: ৪ঠা এপ্রিল ও ৬ই এপ্রিল ১৯৩২-এ বয়াল লবণ আইন অমান্য কেন্দ্রে মহিলাদের নেতৃত্বে ১৫০০ শোভাযাত্রীর উপস্থিতিতে আন্দোলন পরিচালিত হয়। ৮ই মে মঙ্গলচক ও মনুচকে লবণ আইন অমান্য করা হয়।[১৬]

৬নং ইউনিয়ন: বাসুলিয়া, ধান্যখোলা ও মনুচক এই তিনটি স্থানে সত্যাগ্রহ পরিচালিত হয়েছিল।

৭ নং ইউনিয়ন: বিনন্দপুর, বাহাদুরপুর, দাউদপুর, মহম্মদপুর, পুরুষোত্তমপুর ও নন্দীগ্রাম এই ৬টি স্থানে সত্যাগ্রহ চলেছিল। মহম্মদপুর কেন্দ্রে সত্যাগ্রহী কৃষ্ণপদ বেরা ও পঞ্চানন মাইতি আইন অমান্যে ৬ মাস করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।[১৭]

৮নং ইউনিয়ন: রতনপুর, বাহাদুরপুর, বাবুখাবাড়, ধনেশ্বরপুর ও দেবীপুর এই ৫টি স্থানে সত্যাগ্রহ চলেছিল। ১৮ই মে ১৯৩২-এ দেবীপুর কেন্দ্রে সত্যাগ্রহী বিহারীলাল সাঁতরা ও কালীচরণ মণ্ডল গ্রেপ্তার হন ও ৬ মাস করে কারাদণ্ড হয় এবং বিপিন বিহারী দাসের ৪ মাসের কারাদণ্ড হয়।[১৮]

৯ নং ইউনিয়ন: রেয়াপাড়া (পূর্ব ক্যানেল পাড়), মনোহরপুর, খোদামবাড়ী, কৃষ্ণনগর ও আশদতলা এই ৫টি স্থানে সত্যাগ্রহ চলে। মহিলা সত্যাগ্রহী ও ১৫০০ নরনারীর শোভাযাত্রার মাধ্যমে আইন অমান্য করা হয়। পুরুষ সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে সঙ্গে নারী

সত্যাগ্রহীগণও বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই কেন্দ্রের উল্লেখযোগ্য নারী সত্যাগ্রহী ছিলেন স্বয়ম্বরা দাসী, গিরিবালা দেবী প্রমুখ।[১৯]

১০ নং ইউনিয়ন: ফুলনী (খালপাড়), গড়গ্রাম (মছন্দলী ভেড়ী), বলভদ্রপুর (মতির মার হাট), বাঁশগোড়া, শিমলকুন্ডু, কুলবাড়ী, (বাড় শিমুলবাড়ী), বাজাবেড়্যা, পাটনা, রসিকাচক, জামবাড়ী, বাঁকা বোয়ালিয়া ও হাঁসচড়া ১২টি স্থানে সত্যাগ্রহ চলেছিল। ৩রা মার্চ ১৯৩২ সালে হাঁসচড়া কেন্দ্রে আইন অমান্য করা হয়। প্রায় ৫০০০ শোভাযাত্রীর উপস্থিতি ছিল। যার মধ্যে নারীর সংখ্যা ছিল ৬০ ভাগেরও বেশি। পুলিশের লাঠির আঘাতে ৫/৬ জন গুরুতর আহত হয়েছিলেন। মোট আহতের সংখ্যা ছিল ১০০-র বেশি। ১৪ জন পুরুষ সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার বরণ করে ৩ মাস থেকে ৪ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। প্রায় ৫০০ মহিলা সত্যাগ্রহী ও শোভাযাত্রীকে সামনে ও পিছনে পুলিশ প্রহরায় চার মাইল দূরে মগরাজপুরে রাস্তার ওপর রাত্রি ১২টা পর্যন্ত আটকে রাখে। ৪ঠা মে ১৯৩২ এই ইউনিয়নের বাঁকা বোয়ালিয়া কেন্দ্রে কানাইলাল কালসা, হরিপদ মাইতি ও মনীন্দ্র হাজরাকে গ্রেপ্তার করে ৪ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। সুরেন্দ্রনাথ মাইতি ও শম্ভুরাম মাইতিকে পথে ছেড়ে দেয়। এই ইউনিয়নের উল্লেখযোগ্য মহিলা নেত্রী ছিলেন গিরিবালা গিরি, যমুনাবালা রায়, জবাকুসুম ভক্তদাস প্রমুখ বীরাঙ্গনা।[২০]

১১ নং ইউনিয়ন: ঘোলপুকুর, হানুভূঞা (খালপাড়) ও শিবরামপুর—এই তিনটি স্থানে সত্যাগ্রহণ চলে। নারী-পুরুষ উভয়ই এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।[২১]

১২ নং ইউনিয়ন: রাণীচক, টাকাপুরা, কমলপুর, নারানদাঁড়ি ও সাঁইবাড়িতে আইন অমান্য করা হয়। এই পাঁচটি স্থানে সত্যাগ্রহ চলে।[২২]

১৩ নং ইউনিয়ন: ১৯৩২-এর ১৮ই ফেব্রুয়ারী তেখালি বাজারে আইন অমান্য ও আবগারী দোকানে পিকেটিং করায় সাগরচন্দ্র বেরার ৬ মাস, মুরারীমোহন জানা, রাসবিহারী কামিল, সুরেন্দ্রনাথ জানা ও গৌরহরি দাসের ৪ মাস করে কারাদণ্ড হয়। ১৯৩২-এর ২৫শে মার্চ ঐ কেন্দ্রে নিমাই চরণ পালের নেতৃত্বে ৬ জন পুরুষ ও ২৫ জন মহিলা সত্যাগ্রহী সহ ৬০০০ লোকের বিরাট শোভাযাত্রা ভিন্ন ভিন্ন পথে চারিদিকের রাস্তা ধরে "বন্দেমাতরম", "গান্ধিজি কি জয়" ধ্বনি দিতে দিতে চলেছিল। এরপর পুলিশী ঘেরাটোপ অগ্রাহ্য করে নুন প্রস্তুত করে এবং নুনের পুরিয়া বিক্রির আহ্বান জানায়। এই অবস্থায় পুলিশ নিরীহ শোভাযাত্রী ও দর্শকদের উপর নির্মমভাবে লাঠি চালাতে থাকে। অনেকে জ্ঞান হারিয়ে রাস্তার উপর পড়ে রইল। কিন্তু তখনও জনতা ছত্রভঙ্গ না হওয়ায় একজন সশস্ত্র ফৌজ জনতার দিকে বন্দুক তাক করল। সঙ্গে সঙ্গে সত্যাগ্রহী ভুবনচন্দ্র পণ্ডা সেই বন্দুকের সামনে বুক পেতে দিয়েছিল।[২৩] পুলিশ লাথি মেরে ভুবনচন্দ্রকে মাটিতে ফেলে দেওয়ায় মহিলা সত্যাগ্রহী সুমিত্রা দাস এগিয়ে এসে প্রতিবাদ জানায়। তখন পুলিশ বন্দুকের নল জনতার দিকে ঘুরিয়ে গুলি ছুঁড়তে থাকে। এতে গোকুলনগর গ্রামের গোপাল মাজি গুলিবিদ্ধ হন এবং তিনদিন পর বাড়িতে এসে শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। ৭জন পুরুষ সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করে চালান দেয়। বিচারে তাদের ৩ মাস করে জেল হয়। মহিলা সত্যাগ্রহী ও শোভাযাত্রীদের রাত্রি ১২টা পর্যন্ত আটক রাখার পর ছেড়ে দেয়। ৪ঠা মে, ১৯৩২-এ ধান্যখোলা আইন অমান্য কেন্দ্রে ১২ জন নারী ও ১৪ জন পুরুষ সত্যাগ্রহী শ্রীমতী স্বয়ম্বরা বেরার নেতৃত্বে আইন অমান্য করে। ত্রিলোচন পালের ৪ মাস এবং গৌরহরি দাস, মুরারিমোহন আচার্য্য ও সুধাংশু মণ্ডলের ৬ মাস করে কারাদণ্ড হয়।[২৪]

১৪ নং ইউনিয়ন: দাউদপুর, মহম্মদপুর, নয়নান, সাউদখালি, কানুনগোচক ও নানকাচক ছয়টি স্থানে সত্যাগ্রহ চলে। ১৯৩২-এর ২৪শে এপ্রিল কানুনগোচক কেন্দ্রে হরেকৃষ্ণ মাইতি ও ধরণীধর কর গ্রেপ্তার বরণ করেন। প্রত্যেকের ৩ মাস করে কারাদণ্ড হয়। দাউদপুর কেন্দ্রে পুলিশ সত্যাগ্রহী ফণীন্দ্র ত্রিপাঠী, ভূপেন্দ্র ত্রিপাঠীকে প্রহারের পর গ্রেপ্তার করে, বিচারে ৬ মাস করে কারাদণ্ড হয়।[২৫]

১৫নং ইউনিয়ন: চকচিল্লা গ্রাম, গড়চক্রবেড়্যা, কালীচরণপুর, সোনাচূড়া, গাংআড়া, দীনবন্ধপুর ও কিয়াখালি এই ৭টি স্থানে সত্যাগ্রহ চলে।[২৬]

এইভাবে তমলুক মহকুমার নন্দীগ্রাম থানায় লবণ আইন অমান্য আন্দোলন অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে পরিচালিত হয়েছিল। সারা নন্দীগ্রামে ১৫টি ইউনিয়নে ৯৭টি স্থানে সত্যাগ্রহ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। মহিলারাই ছিলেন এই আন্দোলনের প্রধান ভূমিকায়। পুলিশী অত্যাচারের মুখোমুখি হয়েও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও অংশগ্রহণ ছিল এর সাফল্যের মূলে।

তমলুক মহকুমার অন্তর্গত নন্দীগ্রাম থানাতে আইন অমান্য আন্দোলন এক বিশেষ মাত্রা পেয়েছিল। নন্দীগ্রাম থানায় আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে নারীরাও সমানতালে পা মিলিয়েছিলেন। এছাড়া অসংখ্য সাধারণ মহিলা আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত শিবরামপুর গ্রামের নগেন্দ্রনাথ সরকারের সহযোগিতায় ও কুঞ্জবিহারী ভক্তদাসের প্রচেষ্টায় তাঁর আত্মীয় শ্যামাদেবীর (প্রধান) একচালা ঘরে থানার আইন অমান্য সমিতির গোপন অফিসের উদ্বোধন করা হয়েছিল।[২৭] নন্দীগ্রাম থানার তেরপাখিয়া, হাঁসচড়া, বারদুয়ারি, রাধাগঞ্জ, তেখালি প্রভৃতি লবণ কেন্দ্রগুলি বিশেষ উৎসাহের সাথে পরিচালিত হয়েছিল। বহু সংখ্যক নরনারী প্রতিদিন এই কেন্দ্রগুলিতে লবণ প্রস্তুত করতেন।[২৮] এই আন্দোলনে নন্দীগ্রাম থানার অসংখ্য মহিলা অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—চিকনবালা জানা, চিন্ময়ী দাস, সত্যবতী দেবী, সারদাময়ী জানা, মাতঙ্গিনী করণ, মায়ারানী দাস, যমুনা রায়, গিরিবালা প্রধান, কাদম্বিনী প্রধান, খুল্লনা প্রধান, হিরন্ময়ী দাস, নিমাইবালা মাইতি, প্রসন্নকুমারী মাইতি, স্বয়ম্বরা দেবী প্রমুখা নারী। এঁরা প্রত্যেকে আন্দোলনে অংশগ্রহণের অপরাধে জেলও খাটেন।[২৯] নন্দীগ্রাম থানার আদিত্যপ্রভা তিয়াড়ী কলকাতার মদের দোকানে পিকেটিং করার অপরাধে চার মাস জেল খাটেন।[৩০]

১৮ই এপ্রিল বারদুয়ারি খালপাড়ে শ্রীযুক্তা স্বয়ম্বরী বেরার নেতৃত্বে লবণ আইন ভঙ্গ করা হয়।[৩১] এছাড়া লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের সময় নন্দীগ্রাম থানার ১৫টি ইউনিয়নে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন—

- ১ নং ইউনিয়ন-মোক্ষদা ভুয়া, সৌদামিনী মাইতি ও নিত্যবালা গোল।
- ৪ নং ইউনিয়ন-মায়ারাণী দাস, রাণীবালা দাস ও যমুনাবালা রায়।
- ৫-নং ইউনিয়ন-ময়নামতী পাল, চিকনবালা জানা, যমুনা পাল, চিন্ময়ী দাস ও সত্যবতী দেবী।
- ৬নং ইউনিয়ন-সরস্বতী প্রধান।
- ৭ নং ইউনিয়ন—চিকনবালা জানা।
- ৮নং ইউনিয়ন—কুমুদিনী মাইতি।
- ৯ নং ইউনিয়ন—গিরিবালা দেবী, কাদম্বিনী দেবী ও খুল্লনা প্রধান, হিরন্ময়ী দেবী

ও নিস্তারিণী দাস, নিমাইবালা দেবী, যামিনীবালা দেবী, প্রসন্ন কুমারী মাইতি, দুর্গামণি বেরা ও খুল্লনা প্রামাণিক, স্বয়ম্ভরা দাসী।

- ১০ নং ইউনিয়ন—গিরিবালা গিরি, সরোজিনী দাসী, ভগবতী দেবী, জবাকুসুম ভক্তদাস, তিলোত্তমা দেবীও সৌদামিনী মাইতি ।
- ১১ নং ইউনিয়ন—নর্মদাবালা খাটুয়া ও সরযূ দেবী।
- ১২ নং ইউনিয়ন—চিকনবালা জানা (ইনি থানার মহিলা ডিক্টেটর ছিলেন)
- ১৩ নং ইউনিয়ন—স্বয়ম্বরী বেরা, সুমিত্রা দাস।
- ১৫ নং ইউনিয়ন—প্রমিলা জানা[৩২]

নন্দীগ্রাম থানার চণ্ডীপুরের মেনকাবালা সামন্ত এবং গোলবেড়িয়ার রাজবালা মান্না আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নেন। এরা মহিষাদলের লক্ষ্মীমণি হাজরার নেতৃত্বে প্রচার অভিযান, পিকেটিং ইত্যাদিতে অংশ নিয়েছিলেন।[৩৩] ১৯৩২ সালের ২রা জুলাই তমলুক থানার শ্রীরামপুর গ্রামে মহকুমা রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নন্দীগ্রাম থানার ৫ জন মহিলাসহ ২৯ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। যোগদানকারীদের উপর পুলিশ নির্বিচারে লাঠি চালায়। তা সত্ত্বেও সম্মেলন দুদিন চলে, ৪ঠা জুলাই বন্দী দিবস উপলক্ষে নন্দীগ্রাম থানার ৪নং ইউনিয়নের অন্তর্গত নন্দপুর গ্রামের যমুনাবালা রায়ের নেতৃত্বে এক বিরাট শোভাযাত্রা তমলুকের জেল গেটের সামনে পৌঁছালে পুলিশ প্রহরী যমুনাবালার মাথায় সজোরে লাঠির আঘাত করে। এছাড়া ১১ জন মহিলা ও ৪৩ জন পুরুষ প্রতিনিধিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে পুলিশ সুপারিনটেন্ডের কাছে হাজির করলে প্রত্যেককে ৪০ ঘা বেত মেরে ছেড়ে দেওয়া হয়। এদের মধ্যে শ্রীশচন্দ্র পন্ডাকে পুলিশ জলে ডুবায় ও বেত্রাঘাত করে।[৩৪]

১৯৩২ সালের ১৯শে আগস্ট অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন রবীন্দ্রনাথ বারিক থানার সবকটি ইউনিয়নের ৩০ জন মহিলা ও ৬৭ জন পুরুষ প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। মহিলা প্রতিনিধিদের মধ্যে ভগবতী দেবী, ময়নামতী পাল, জবাকুসুম ভক্তদাস, সারদাবালা মান্না ও তেরপাখিয়া বাজারের বারাঙ্গনা সত্যবতী দেবী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। সভা চলাকালীন পুলিশ মহিলা প্রতিনিধিদের উপর প্রচণ্ডভাবে লাঠি চালাতে থাকে এবং তাদের তলপেটে সবুট লাথি মারতে থাকে। ৩০ জন মহিলা প্রতিনিধি প্রহৃত হন। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি রবীন্দ্রনাথ বারিক এবং মূল সভানেত্রী চিকনবালা জানাকে গ্রেপ্তার করে। বিচারে তাদের যথাক্রমে ৬ মাস ও ৪ মাস কারাদণ্ড হয়। অন্যান্য আহত মহিলাদের স্থানীয় সেবাকেন্দ্রে সেবা শুশ্রূষা করা হয়—সকলেই ৭/৮ দিন তলপেটের যন্ত্রণা ও শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট ভোগ করেন।[৩৫] যে সমস্ত মহিলারা আন্দোলনে অংশগ্রহণের ফলে দৈহিক আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন তাঁদের কয়েকজন হলেন—১ নং ইউনিয়নের নন্দিনী দাস, ২ নং ইউনিয়নের উমাসুন্দরী পড়িয়া, ৩ নং-এর শৈলবালা দোলই, চারুবালা দোলই, ভগবতী বিষয়ী, সারদাবালা মান্না, ৪ নং-এর মাখনবালা দাসী, ৫ নং-এর স্নেহলতা মাইতি, যমুনামতী পাল, যমুনাবালা বাল, সত্যবালা দেবী ও শোভাময়ী প্রধান। ৭ নং-এর বেহুলাবালা দেবী, বিমলাবালা দাস, ননীবালা পাত্র, অমলাবালা করণ, ননীবালা দাস, কামিনীবালা দাস, শান্তিলতা দাস ও বিমলাবালা দাস ৯ নং-এর সরস্বতী প্রধান, ফুল্লনা প্রধান ও গিরিবালা প্রধান, ১০ নং এর শৈলবালা প্রামাণিক, শৈলবালা বেরা, জবাকুসুম ভক্তদাস, ভগবতী দেবী, গিরিবালা গিরি ও কিরণবালা সামন্ত,

১৩ নং-এর সাবিত্রীসুন্দরী দাস, ললিতা মণ্ডল, শ্যামাসুন্দরী জানা, বীণাসুন্দরী দাস, বিভাবতী পাল, আনন্দা গিরি ও স্বয়ম্বরা বেরা, ১৪ নং এর কুঞ্জবালা ভৌমিক এবং ১৫ নং-এর প্রমিলা জানা, দৈবকী দাস, রাধিকা দাস, সরস্বতী দেবী।[৩৬] এছাড়াও বড়তল্যা গ্রামের ভূষণচন্দ্র চক্রবর্তীর স্ত্রী রাজবালা চক্রবর্তী লবণ সত্যাগ্রহের সময় স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী সঙ্গে নিয়ে লবণ উৎপাদন কেন্দ্রে কাজ করতে গিয়ে পুলিশের হাতে নিগৃহীত হন। ঐ সময় ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেওয়ার ফলে তাঁকে দৈহিক নির্যাতন ও আর্থিক দিক দিয়ে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছিল।[৩৭] এইভাবে তমলুক মহকুমায় নন্দীগ্রাম থানার সর্বস্তরের এক বৃহৎ সংখ্যক মহিলা আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এক বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামে তমলুক মহকুমার নন্দীগ্রাম থানার অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পর্বেই নন্দীগ্রাম থানার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রায় প্রতিটি নাগরিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তার মধ্যে মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং ভূমিকা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নন্দীগ্রামের এমনই এক বীরাঙ্গনা হলেন চিকনবালাদেবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত বোয়াল গ্রামে। তাঁর পিতার নাম ছিল নিধিরাম প্রধান এবং মাতার নাম ছিল ভগবতী প্রধান। বাল্যকালেই চিকনবালা দেবীর বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল তখন তার বয়স ছিল মাত্র এগারো বৎসর। চিকনবালাদেবী যখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ছেন তখন তাঁর সঙ্গে নন্দীগ্রামেরই ভেকুটিয়া গ্রামের সম্পন্ন ব্যক্তি কুঞ্জবিহারী জানার সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন হয়। কুঞ্জবিহারীবাবু নন্দীগ্রাম থানা কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন এবং বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি পেশায় ফটোগ্রাফার ছিলেন। মূলত তিনি স্বামীর উৎসাহেই এবং অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে ব্রতী হন। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। পরবর্তী সময়ে বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রিয়নাথ জানা এবং নন্দীগ্রাম থানা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি রাজেন্দ্রনাথ ভূঞার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় সক্রিয়ভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দেন। সেইসঙ্গে দেশের মুক্তির সংগ্রামে ব্রতী হন। চিকনবালা দেবী প্রাথমিক অবস্থায় সেরকম রাজনীতি সচেতন ছিলেন। পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রিয়নাথ জানা এবং রাজেন্দ্রনাথ ভূঞার সযত্ন তত্ত্বাবধানে তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিক সচেতনতা এবং ব্রিটিশের অপশাসন সম্বন্ধে ধারণা জাগ্রত হয়ে ওঠে।[৩৮]

চিকনবালা দেবী নন্দীগ্রামের বিভিন্ন গ্রামগুলিতে যে সভাগুলি অনুষ্ঠিত হত তাতে তিনি যোগ দিতেন। বীরাঙ্গনা চিকনবালা দেবী রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়েছিল রাজনৈতিক সভায় যোগদানের মধ্য দিয়ে তিনি গান্ধিজীর বিদেশীদ্রব্য বর্জনের ডাকে সাড়া দিয়ে বিলিতি দ্রব্য বিক্রয়কারী দোকানগুলির সামনে পিকেটিং-এ যোগ দেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে ১৯৩০ সালে গান্ধীজির নেতৃত্বে অহিংস লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে চিকনবালা দেবীও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দেন এবং ১৯৩২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি তিনি দুর্গাপুর লবণ উৎপাদন কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং তিনি চিন্ময়ী দাস, সত্যবতী দাস প্রভৃতি বীরাঙ্গনাদের সঙ্গে নিয়ে বিপুল উৎসাহে লবণ উৎপাদন করে ব্রিটিশ লবণ আইন ভঙ্গ করেন। চিকনবালা দেবী শুধুমাত্র নিজেই আন্দোলনে অংশ নেয়নি তিনি সেইসঙ্গে স্থানীয় মহিলাদেরও আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেন। যেমন গরানবেড়িয়া গ্রামের অরণ্য দাসের স্ত্রী চিন্ময়ী দেবী কিংবা তেরপাখিয়ার সত্যবতী দেবীদেরও উৎসাহিত করে

তুলেছিলেন এবং আরও বহু মহিলাদের সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলনে সামিল করেছিলেন। বীরাঙ্গনা চিকনবালা দেবী নন্দীগ্রামের দুর্গাপুর লবণ কেন্দ্রে লবণ সত্যাগ্রহ করা কালীন সময়ে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং তাকে নন্দীগ্রাম থানায় ধরে নিয়ে যায় এবং সেখানেই তাকে বসিয়ে রাখে। চিকনবালাদেবী ব্রিটিশ লবণ আইন ভঙ্গ করার অপরাধে তমলুক কোর্টের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এইচ.এল.সরকার অতি দ্রুত তাঁর বিচার করে এবং বিচারে (Section 17(1) Cr. L.A. Act) তাঁর তিন মাসের জেল হয় এবং তাঁকে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে প্রেরণ করা হয়।[৩৯] এইসময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র আঠারো বছর।[৪০] জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর পুনরায় তিনি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা ধরনের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হন এবং এর ফলস্বরূপ তিনি আবার ব্রিটিশ পুলিশের হাতে নির্যাতিত হন। এপ্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখনীয়, ১৯৩২ সালের ১৯শে আগষ্ট অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ বারিক। আমদাবাদে থানা রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সদ্য জেল থেকে মুক্ত চিকনবালা জানা সাধারণ অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। থানার সব কয়টি ইউনিয়নের ৬৭ জন পুরুষ ও ৩০ জন মহিলা প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন। মহিলা প্রতিনিধিদের মধ্যে সত্যবতী দেবী, ভগবতী দেবী, ময়নামতি পাল, জবাকুসুম ভক্তদাস, বিমলা দাস ও সারদাবালা মান্না বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রবি বাবু তাঁর ভাষণ পঠ শত্রু করা মাত্র অত্যাচারী দারোগা মফজ্জল হোসেন ১১ জন সশস্ত্র পাঠান ফৌজ ও ১০/১২ জন থানার পুলিশ তাঁর ক্ষীপ্রতায় মহিলা প্রতিনিধিদের উপর প্রচন্ডভাবে লাঠি চালাতে থাকে ও তাঁদের তলপেটে বার বার সবট লাথি মারতে থাকে। দারোগা মফজ্জল অতীতের তেরপেখিয়া বাজারের বারাঙ্গনা সত্যবতীকে, বর্তমানে স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরাঙ্গনার রণরঙ্গিণী মূর্তি দেখে জাত ক্রোধে তাঁকে টেনে হিচড়ে পাকুর পড়ে নিয়ে গিয়ে প্রচন্ড প্রহারে অচৈতন্য করে দেয় এবং তাঁর লজ্জাস্থানে বার বার সবুট লাথি মারতে থাকে। সত্যবতী মাসাবধি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকেন ও প্রস্রাবদ্বারে অসহ্য যন্ত্রণায় কষ্ট পান। ৩০ জন মহিলা প্রতিনিধি প্রহত হন এবং সকলকেই তলপেটে সবুট লাথির আঘাত সহ্য করতে হয়। সঙ্গে বেত্রাঘাতও চলেছিল। সম্মেলনে উপস্থিত ৫/৬ হাজার জনসাধারণকে পুলিশ বেপরোয়াভাবে লাঠির আঘাতে আহত করেছিল। একজন যোগদানকারী প্রহারের আঘাতে পুকুরে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যখন জলে ডুবে যাচ্ছিল তখন এক চৌকিদার তাঁকে উদ্ধার করে। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি রবীন্দ্রনাথ বারিক এবং মূল সভানেত্রী চিকনবালা জানাকে ১৯৩২ সালে ১৯শে আগস্ট গ্রেপ্তার করে তমলুক কোর্টে চালান করে দেয়।[৪১] গ্রেপ্তার হওয়ার পর বিচারে (Section 17 (1) Cr. L.A.Act) তাকে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।[৪২] প্রথমে তাঁকে ১৯শে থেকে ২৪শে আগস্ট ১৯৩২ পর্যন্ত তমলুক সাব জেলে বন্দী রাখা হয় তারপরে সেখান থেকে ২৫শে আগস্ট তাঁকে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয় এবং অবশেষে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ সালে তাকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।[৪৩] চিকনবালা দেবীকে কোনোভাবেই ব্রিটিশ পুলিশ দমিয়ে রাখতে পারেনি। আইন ভঙ্গ করে জেল খেটেছেন, জেল থেকে ছাড়া পেয়ে পুনরায় তিনি আন্দোলনে সামিল হয়েছেন এবং ব্রিটিশ পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছেন কিন্তু চিকনবালা দেবী আন্দোলনের পথ থেকে একটুও সরে যাননি। গ্রেপ্তার হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে সভা-সমিতিতে যোগদান করতে থাকেন।

দেশের মুক্তি সংগ্রামে চিকনবালা দেবীর মত একজন সাধারণ গ্রাম্য বধূর যে আত্মত্যাগ এবং সাহসিকতা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিরল। তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষত অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিকনবালাদেবী হলেন একজন চিরস্মরণীয় নাম। তাঁর বীরত্ব, সাহসিকতা, স্বদেশপ্রীতি, সাংগঠনিক প্রতিভা ছিল সত্যিই অবিস্মরণীয়। যে কারণেই তিনি একইসঙ্গে তমলুক সমর পরিষদ এবং নন্দীগ্রাম সমর পরিষদের ডিক্টেটর হিসাবে মনোনীত হয়েছিলেন। ডঃ রীনা পালের গ্রন্থ 'Women of Midnapore in Indian Freedom Struggle' থেকে জানা যায় যে, চিকণবালা দেবী নন্দীগ্রাম থানার বেশ কয়েকজন বীরাঙ্গনা রমণীকে সঙ্গে নিয়ে সাফল্যের সভা অনুষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। সেই সমস্ত বীরাঙ্গনা রমণী হলেন—স্বাধীনতা সংগ্রামী কুঞ্জবিহারী ভক্তদাসের স্ত্রী এবং বঙ্গভূষণ ভক্তর মাতা জবাকুসুম ভক্তদাস, তেরোপাখিয়ার বারাঙ্গনা রমণী সত্যবতী দেবী, ধান্যশ্রী গ্রামের ভগবতী দেবী, ময়নামতী পাল, সারদাবালা মান্না এবং বিমলা দাস প্রমুখ। তাঁর দুঃসাহসিকতা, কর্মনিষ্ঠা, দেশের জন্য আত্মত্যাগ, ভারতবর্ষের মুক্তি সাধনের জন্য তাঁর যে ত্যাগ স্বীকার তা নিঃসন্দেহেই মানুষের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে হয়তো প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করতে পারেনি কিন্তু তমলুক মহকুমায় আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে বিশেষ করে মহিলাদের আন্দোলনে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধকারী হিসাবে তিনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। জানা যায় তিনি আন্দোলনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর শ্বশুরবাড়ির দিক থেকে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা কোনোভাবেই চাননি যে বাড়ির বধূ স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিক। কিন্তু তিনি সমস্ত বাধাকে উপেক্ষা করেই স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন এবং দেশমাতৃকার মুক্তি সাধনে তিনি সর্বস্ব পণ করে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি তাঁর লক্ষ্যে অবিচল ছিলেন। বীরাঙ্গানা চিকনবালা দেবীর আত্মত্যাগ ও বীরত্ব ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল।

References

১। ত্রিপাঠী,অমলেশ, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫-১৯৪৭*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ভাদ্র,১৪০৫, পৃঃ ১৫৪

২। মল্লিক, সমর কুমার, *আধুনিক ভারতের রূপান্তর রাজ থেকে স্বরাজ (১৮৫৮- ১৯৪৭)*, ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলি পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃঃ ৫৩৬।

৩। লাহিড়ী,সোমনাথ, *সংগ্রাম ও সঙ্কল্প* ,২৬.০১.১৯৬৩.

৪। Fischer, Louis, *Life of Gandhi*, p.292

৫. *Ibid.*

৬. Gandhi, *Complete Works*, Vol-42, p.499

৭। দাস, মন্মথনাথ, *মুক্তিযুদ্ধে মেদিনীপুর*, দে পাবলিকেসান , অক্টোবর ,২০১৪, পৃঃ ৫৮।

৮। চট্টোপাধ্যায়, প্রনব কুমার, *আধুনিক ভারত (১৯২০- ১৯৬৪) দ্বিতীয় খণ্ড*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, এপ্রিল,২০১৪, পৃঃ ৮৩।

৯। দাস, বসন্তকুমার, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর*, দ্বিতীয় খণ্ড, মেদিনীপুর স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস সমিতি, কোলকাতা, ১৯৮০, পৃঃ ৭।

১০। *তদেব*, পৃঃ ৭।
১১। চট্টোপাধ্যায়, গৌরীপদ, *দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার ইতিহাস*, কাকলি, ১৯৮৬, পৃঃ ৩১১।
১২। *তদেব*, পৃঃ ৩১১।
১৩। Chatterjee, Ramananda (Ed.), *The Modern Review*, August, 1910, p.124.
১৪। ভক্ত,বঙ্গভূষণ, *নন্দীগ্রামে স্বাধীনতা সংগ্রাম*, আনন্দম, গোপালপুর, মেদিনীপুর, ১৯৮৩, পৃঃ ৮৪।
১৪ক। বঙ্গীয় সমর পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত,'*ইংরেজের সুশাসন'*, পৃঃ ২১।
১৫। ভক্ত, বঙ্গভূষণ, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ*, পৃঃ ৭২-৭৩।
১৬। বঙ্গীয় সমর পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত, '*ইংরেজের সুশাসন'*, পৃঃ ৫৮।
১৭। *তদেব*, পৃঃ ২১।
১৮। ভক্ত,বঙ্গভূষণ, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ*, পৃঃ ৭৪।
১৯। *তদেব*, পৃঃ ৭৪-৭৬।
২০। বঙ্গীয় সমর পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত, '*ইংরেজের সুশাসন'*, পৃঃ ২১; ভক্ত, বঙ্গভূষণ, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ*, পৃঃ৭৭।
২১। ভক্ত, বঙ্গভূষণ, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ*, পৃঃ ৭৭ ।
২২। *তদেব*, পৃঃ ৭৮।
২৩। বঙ্গীয় সমর পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত, *'ইংরেজের সুশাসন'*, পৃঃ ২১; ভক্ত, বঙ্গভূষণ, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ*, পৃঃ১৫।
২৪। ভক্ত,বঙ্গভূষণ, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ*, পৃঃ৭৮-৭৯।
২৫। *তদেব*, পৃঃ ৭৯।
২৬। *তদেব*, পৃঃ ৭৯-৮০ ।
২৭। *তদেব*, পৃঃ ৬২ ।
২৮। দাস,বসন্ত কুমার, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ*, পৃঃ৮৫।
২৯। *Amrita Bazar Patrika*, 16th February, 1932.
৩০। 'ইংরেজের সুশাসন',বঙ্গীয় সমর পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ৩৬৫।
৩১। দাস, বসন্ত কুমার, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ*, পৃঃ ৮০-৮১।
৩২। ভক্ত, বঙ্গভূষণ, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ*, পৃঃ ১১৮।
৩৩। মাইতি,প্রদ্যোতকুমার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১১৭ ।
৩৪। ভক্ত,বঙ্গভূষণ, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ*, পৃঃ ১১৮।
৩৫। তদেব, পৃঃ ১১৮-১১৯; 'নন্দীগ্রাম বুলেটিন', ২৫শে আগস্ট, ১৯৩২ ।
৩৬। 'নন্দীগ্রাম বুলেটিন' (১৯৩২-১৯৩৩); মাইতি, প্রদ্যোত কুমার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১১৭-১১৮।
৩৭। *স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনপঞ্জী*, তাম্রলিপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস কমিটি, তমলুক, মেদিনীপুর, ১৯৮৭, পৃঃ ১৬৮।
৩৮। Pal, Rina, *Women of Midnapore in Indian Freedom Struggle*, Ratna Prakashan, Calcutta,1996, p.124
৩৯। Midnapore Central Jail Records, 05 04.32 to 06.06.32.; Ghosh, Dr. Nirajan, *Role of Women in the Freedom Movement in Bengal (1919-1947) (Midnapore, Bankura and Purulia District)*, Tamralipta Prakashani, Midnapore, 1988, P 158.

৪০। Pal, Rina, *Op. Cit.*, p.124.
৪১। ভক্ত,বঙ্গভূষণ, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ,* পৃঃ ১১৮-১১৯।
৪২। Pal, Rina, *Op. Cit.*, p.124
৪৩। *Midnapore Central Jail Records*, 01.12.32 to 06.02.33.

——